Rajshahi University journal of arts & law Vol. 53 (2025) pp. 91-99
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0723

মহাভারতের সমাজ: বর্ণ ও আশ্রম প্রথা
[The Society of the *Mahabharata*: Caste and Social Order]

হৈমন্তী শুক্লা কাবেরী*

Abstract

The *Mahabharata* is considered an epic, but its historical value is undeniable. The narrative, which has long been studied as an aural scripture, traces the history of Indian civilization from its inception to the development of urban life. In this sense, the structure of the social system of that time has been detailed in the book. One of the phases of this transitional period of society is the 'Varnashram' custom. Which is a combination of the words 'Varna' and 'Ashram' have both literal and philosophical meanings. Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras– the four classes in this case, refer to 'Varna', and 'Ashram' means the four stages of caste-centered lifestyle: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha and Sannyas. The social system of that time was regulated through this system. In this context, the *Mahabharata* is one of the principal sources of Indian social records. This essay, therefore, aims to analyze the social systems evolved through castes and ashrams over time with reference to the *Mahabharata*.

Keywords: The *Mahabharata*, Varna, Ashram, Varnashram, Social system.

১.

মহাভারতের আখ্যান সুদীর্ঘকাল ধরে পরিগঠিত। গ্রন্থটিতে বিধৃত হয়েছে কয়েক হাজার বছরের জীবনধারার ইতিহাস। সেই সূত্রেই জানা যায়, আদিতে মানুষ বন্য জীবন-যাপন করতো। শিকার এবং আহরণই ছিল তখন প্রধান বৃত্তি। অর্থাৎ তখনও মানুষের নির্দিষ্ট সামাজিক জীবন ছিল না। কাল-পরিক্রমায় পশু-পালন করতে শিখে সংঘবদ্ধ বসবাসের মাধ্যমে তারা সূচনা করে সামাজিক জীবন। এ-পর্বে আগুনের ব্যবহার আয়ত্ত হলে, ধাতুনির্মিত অস্ত্র দ্বারা বন উজাড় করে মানুষ চাষযোগ্য ভূমি তৈরি করে। প্রবর্তিত হয় কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। পালিত পশুকে কর্ষণের কাজে ব্যবহার করতে শিখলে কৃষি-সভ্যতার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ফলে মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করতে শুরু করে। আর এই উদ্বৃত্ত উপভোগের জন্য প্রবর্তিত হয় বর্ণব্যবস্থা।[১] *মহাভারতের* ভাষ্য অনুসারে, বন্যজীবন থেকে উন্নীত পশুপালন ও কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রবর্তন করেছিলেন রাজা পৃথু[২]। কৃষিভিত্তিক সেই সমাজে সম্পত্তির মালিকানার ধারণা থেকেই ক্রমশ বিকশিত হয়েছে 'বর্ণাশ্রম' প্রথা।

'বর্ণাশ্রম' শব্দটি সন্ধির মাধ্যমে গঠিত, যার মূলে রয়েছে 'বর্ণ' ও 'আশ্রম' শীর্ষক দুটি স্বতন্ত্র শব্দ। 'বর্ণ' বলতে বোঝায় ভারতীয় সনাতন-সমাজের চতুর্বর্গ: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। আর 'আশ্রম' হলো বর্ণকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিধি; *মহাভারতে* বর্ণিত প্রাচীন সমাজে যা প্রচলিত ছিল। বর্ণের মতো আশ্রমও ছিল চার ধরনের: ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ বা সন্ন্যাস। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে 'বর্ণাশ্রম' প্রথার উৎপত্তি প্রসঙ্গে শঙ্কর শীল বলেছেন: "সম্পত্তি ও ধনের বৈষম্য গোষ্ঠীবদ্ধ অখণ্ড সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করল, সমষ্টিবদ্ধ সমাজে ভাঙন ধরল এবং একদা-অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ সমাজ ক্রমে বিভক্ত হয়ে পড়ল নানা গোষ্ঠীতে এবং পরবর্তী কালে নানা শ্রেণীতে।"[৩] অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের বিধানানুসারেই প্রাচীন ভারতবর্ষে সুসংহত করা হয়েছিল সামাজিক জীবন-ব্যবস্থা।

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস ও সভ্যতা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা ৯২০৮ বাংলাদেশ;
ই-মেইল: kabery@hc.ku.ac.bd

২.

প্রাচীনকালের বিভিন্ন শাস্ত্র, যেমন *ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ* বা *প্রজাপতি সংহিতায়* চতুর্বর্ণের উৎপত্তি-প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। এগুলিরও প্রাচীন শাস্ত্র *ঋগ্বেদের* 'পুরুষ' সুক্তে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।/ উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"[৪] আবার বেদোত্তরকালের টীকাকার যাজ্ঞবল্ক্য বেদেরই পুনরোক্তি করে বলেছেন: "ব্রহ্মাস্যতো ব্রাহ্মণাঃ সংপ্রসূতা বাহুভ্যাং বৈ ক্ষত্রিয়াঃ সংপ্রসূতাঃ।/ নাভ্যাং বৈশ্যাঃ পাদতশ্চাপি শূদ্রা সর্ব্বে বর্ণা নান্যথা বেদিতব্যাঃ॥"[৫] অর্থাৎ আদি-পুরুষ ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পাদযুগল থেকে শূদ্রের জন্ম হয়। *গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ এ-প্রসঙ্গে অর্জুনকে বলেছেন:

> চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
> তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥[৬]

উক্ত শ্লোকানুসারে, গুণ ও কর্মের পার্থক্যের নিরিখে শ্রীকৃষ্ণ চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছিলেন এবং কর্তা হয়েও অকর্তা হিসেবে নিজেকে অবগত হওয়ার জন্য তিনিই অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ *মহাভারতের* কালেই চতুর্বর্ণের উৎপত্তির ধারণা পরিবর্তিত হয়। তবে *বেদে* উদ্ধৃত বর্ণের উৎপত্তির ধারণাটিই সর্বজনসিদ্ধ। সেই চতুর্বর্ণ সাধারণত জন্মের মাধ্যমেই নির্ধারিত। তাই বলা হয়ে থাকে, পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ মনুষ্য-জন্ম এবং বর্ণপ্রাপ্তি ঘটে এবং ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য এবং শূদ্রের পুত্র শূদ্র রূপে পরিচিতি লাভ করে। বর্ণের উৎপত্তির মতো *মহাভারত*কালেই বর্ণপ্রাপ্তির ধারণারও বদল হয়। সে-সময় বর্ণ প্রাপ্তির প্রধানত দুটি ধরন লক্ষ করা যায়: (ক) জন্মের মাধ্যমে; (খ) কর্মের মাধ্যমে। অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমে ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব বা ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি হতো; তবে জন্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত বর্ণ তাতে কখনও বিলুপ্ত হতো না, কেবল কর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত বর্ণ কর্ম-পরিচয়কে অধিক প্রকাশ করতো।

শাস্ত্রানুসারে চার বর্ণের কর্ম সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত। ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাস, ক্ষত্রিয়র প্রজাপালন, বৈশ্যের কুসীদ অর্থাৎ সুদ নেওয়া, কৃষি ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের প্রধান কর্ম হলো অপর তিন বর্ণের সেবা করা। কিন্তু *মহাভারত*কালেই বর্ণ অনুসারে নির্ধারিত কর্ম পালনেও বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। সেই বিচ্যুতির কার্যকারণ হিসেবে ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে:

> ক্ষাত্রাণি বৈশ্যানি চ সেবমানঃ শৌদ্রাণি কর্ম্মাণি চ ব্রাহ্মণঃ সন্।
> অস্মিল্লোকে নিন্দিতো মন্দচেতাঃ পরে চ লোকে নিরয়ং প্রয়াতি॥[৭]

অর্থাৎ মন্দ বুদ্ধির কারণে কোনো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের কর্ম করলে ইহলোকে নিন্দিত এবং পরলোকে নরক প্রাপ্ত হন। *মহাভারতে* দেখা যায়, পরশুরাম জন্ম পরিচয়ে ব্রাহ্মণ হয়েও কর্মে ছিলেন ক্ষত্রিয়। তবুও তিনি অবতার হিসেবে নন্দিত। তবে *মহাভারতেই* সকল ব্রাহ্মণের কর্মবিচ্যুতির ফল এক রকম হয়নি। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামা জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ হয়েও কর্মে ক্ষত্রিয় ছিলেন। অশ্বত্থামা পাঞ্চালের এক অংশের রাজা হন এবং ক্ষত্রিয় বৃত্তি অনুসারে সমস্ত জীবন যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছেন, কিন্তু কর্মের কারণে তিনি নন্দিত হননি। কেবল ব্রাহ্মণই নয়, *মহাভারতে* ক্ষত্রিয়দেরও কর্মবিচ্যুতি লক্ষণীয়। যেমন, দুর্যোধন ও দুঃশাসন জন্মগতভাবে ক্ষত্রিয় হয়েও বৈশ্য ও শূদ্রের ন্যায় আচরণ করেছেন। আর বিদুর জন্মগতভাবে শূদ্র হয়েও (মাতার বর্ণ অনুসারে) কর্ম করেছেন ব্রাহ্মণের মতো। সে-কারণে কর্মগত বর্ণপ্রাপ্তিকে স্বভাবগত বর্ণও বলা যায়।

মহাভারতে বিধৃত রাজা ভরত কিংবা ভূমন্যুর কালে সমাজে প্রচলিত বর্ণপ্রথার স্তরবিন্যাস ছিল যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। শান্তনুর রাজত্বকাল পর্যন্ত এই বিন্যাস মেনে চলা হতো। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের রাজত্বকালে বর্ণাশ্রমের এই ধরন অনেকটাই বদলে যায়; রাজা হিসেবে ক্ষত্রিয়রা হয়ে উঠেন ব্রাহ্মণদের

চেয়ে প্রভাবশালী এবং রাজ ক্ষমতার তাঁরা অপব্যবহার শুরু করেন। সে-সময়ে বৈশ্য এবং শূদ্রের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন না-ঘটায় ক্ষমতাবাহিত বর্ণাশ্রমের স্তরবিন্যাস হয়ে ওঠে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র। অর্থাৎ ক্ষমতার অগ্রভাগে তখন থেকে বিরাজ করতে থাকেন ক্ষত্রিয়রা, তারপর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র। এ-প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন: "যদিও অসংখ্য ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু মহাভারতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অধীন এবং তার উপদেশ ক্ষত্রিয়ের শিরোধার্য নয়।"[৮] *মহাভারতে* রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সে-কারণেই ব্রাহ্মণদের তুলনায় অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। নিজ পুত্র দুর্যোধনকে উত্তরাধিকারী যুবরাজ হিসেবে মনোনীত করতে তিনি রাজগুরু কৃপাচার্য, রাজ শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের সিদ্ধান্তও অমান্য করেছেন। শুধু তাই নয়, রাজ আনুকূল্যে জীবিকা নির্বাহকারী হিসেবেও বিদ্রূপও করেছেন তাঁদের। ব্রাহ্মণরাও তখন সম্মান হারিয়ে রাজার আজ্ঞাবাহী অনুগত শ্রেণিতে পরিণত হন এবং ক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তৈরি হয় এক ধরনের সমঝোতার সম্পর্ক।

৩.

চতুর্বর্ণের মতো সে-কালে আশ্রমও ছিল চার রকম: ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ বা সন্ন্যাস। *মহাভারতে* এই চতুরাশ্রমের আলোচনা সম্পর্কে প্যাট্রিক অলিভেল (জ. ১৯৪২) (Patrick Olivelle) বলেছেন: "As we have seen, discussions of the asramas in the *Mahabharata*, especially within the *Santiparvan*, which contains most of the didactive and dharmasastric passages, usually follow the pattern of the classical system."[৯] তবে *মহাভারতের* শান্তিপর্বে বর্ণিত সবগুলো আশ্রম সকল বর্ণের জন্য প্রযোজ্য ছিল না, কেননা বর্ণভেদে আশ্রম গ্রহণের বিধি ছিল নির্দিষ্ট। এ-প্রসঙ্গে মহামহিম ভীষ্ম বলেছেন:

ক. বানপ্রস্থং ভৈক্ষংচর্য্যং গার্হস্থ্যঞ্চ মহাশ্রমম্।
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং প্রাহুশ্চতুর্থং ব্রহ্মণৈর্বৃত্॥[১০]

খ. ব্রাহ্মণস্য তু চত্বারস্ত্বাশ্রমা বিহিতাঃ প্রভো!
বর্ণাস্তান্ নানুবর্ত্তন্তে ত্রয়ো ভরতসত্তম!॥[১১]

গ. চাতুরাশ্রম্যধর্ম্মাশ্চ বেদধর্ম্মাশ্চ পার্থিব!।
ব্রাহ্মণেনানুগন্তব্যা নান্যো বিদ্যাৎ কদাচন॥[১২]

ঘ. সর্ব্বাণ্যেতানি কৌন্তেয় বিদ্যন্তে মনুজর্ষভ।
সাধ্বাচার প্রবৃত্তানাং চাতুরাশ্রম্যকারিণাম্॥[১৩]

উদ্ধৃতি 'ক' অনুসারে, বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ, গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য; এই চার আশ্রমই ব্রাহ্মণেরা অবলম্বন করতে পারতেন। আর উদ্ধৃতি 'খ' অনুসারে, ব্রাহ্মণের জন্য ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি চারটি আশ্রমই বিধিসম্মত; কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর তিন বর্ণ সেগুলি অনুসরণ করতে পারতেন না। ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে যেমন চতুরাশ্রম পালন বিধিসম্মত, অন্য তিন বর্ণের ক্ষেত্রে তা বিধিনিষিদ্ধ বলা হয়নি। তবে অপর তিন বর্ণ চতুরাশ্রম পালন করতেন না বলে উল্লিখিত হয়েছে। অন্যদিকে উদ্ধৃতি 'গ' অনুসারে, ব্রাহ্মণ চারটি আশ্রমধর্ম এবং *বেদ* অনুসৃত ধর্ম অনুসরণ করতেন। কিন্তু এইসব ধর্ম শূদ্ররা কখনো অনুসরণ করতেন না। অর্থাৎ চার আশ্রম পালন বিধিনিষিদ্ধ না-হলেও শূদ্ররা তা পালন থেকে বিরত থাকতেন। আর উদ্ধৃতি 'ঘ' অনুসারে, চার বর্ণের সদাচারী সকলেরই আশ্রমধর্ম থাকতে পারে। অর্থাৎ আশ্রমধর্ম অনুসরণের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নির্বিশেষে চার বর্ণেরই সদাচারী হওয়া অত্যাবশ্যক। তার মানে আশ্রমধর্ম পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সদাচার। এ-ক্ষেত্রে বর্ণের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু *মহাভারতেই*

আবার শূদ্রের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে: "যে শূদ্র তার কর্তব্যকর্ম করেছে এবং সন্তানের জনক হয়েছে, সে যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সদাচারী হয়, রাজার অনুমতি নিয়ে ভৈক্ষ্য ভিন্ন অন্য আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে।"[১৪] অর্থাৎ সদাচারী হলেও শূদ্ররা ভৈক্ষ্য গ্রহণ করতে পারতেন না। কিন্তু সদাচারী হলে অন্যান্য বর্ণ সকল আশ্রম পালন করতে পারতেন। অর্থাৎ শূদ্রের ক্ষেত্রে আশ্রম গ্রহণে বিধিনিষেধ থাকলেও অন্য বর্ণের ক্ষেত্রে কোনো নিষেধ ছিল না।

আশ্রমধর্ম আচরণের জন্য তখন সমগ্র জীবনকালকে চার পর্বে ভাগ করা হতো। একেকটি পর্বে পালন করতে হতো একেক আশ্রম: প্রথম পর্বে ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয় পর্বে গার্হস্থ্য, তৃতীয় পর্বে বানপ্রস্থ এবং চতুর্থ পর্বে সন্ন্যাস। যিনি ব্রহ্মচর্য পালন করতেন তাকে বলা হতো 'ব্রহ্মচারী'। কায়মনে তিনি ব্রহ্মের সেবা করতেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে:

> ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
> তদর্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥[১৫]

অর্থাৎ 'উপনয়ন' সংস্কারের পরে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে গমন করে ছত্রিশ বছর, তার অর্ধকাল বা পাদকাল বা যতদিন আবশ্যক গুরুগৃহে বাস করে 'বেদত্রয়' অধ্যয়ন করতেন। সবসময় একা থেকে পঠিত বেদের চিন্তা, ইষ্টমন্ত্র জপ এবং পানভোজনসহ সমস্ত কর্ম করতেন তাঁরা। 'মলকর্দ্দমসংসৃষ্ট' থেকেও তিনি একমাত্র গুরুর সেবায় নিয়োজিত থাকতেন এবং গুরুগৃহে বাস করতেন। শুচিতার সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা করতেন অগ্নি এবং সূর্য দেবতার উপাসনা। উপাসনা শেষে তাঁরা বেদাভ্যাস এবং ভিক্ষা করে হবিষ্য ভোজন করতেন। ব্রহ্মচর্যের সকল নিয়ম গুরুর নির্দেশানুসারেই পালন করতে হতো। এছাড়া কাম, ক্রোধসহ সকল রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্রহ্মচারী কঠোর তপস্যা করতেন। আর চিত্তে বৈগুণ্য দেখা দিলে করতেন প্রায়শ্চিত্ত। তিনি স্বগৃহে ফিরে যেতেন 'সমাবর্ত্তন' সংস্কারের মাধ্যমে। এই সংস্কার পালনে গুরুর অনুমতি নিয়ে সাধ্যমতো তাঁকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করে ব্রত সম্পন্ন করার পর গুরুর আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক তাঁর উপদেশ শ্রবণ করতে হতো। সমাবর্তন পরবর্তী ও বিবাহ পূর্ববর্তী কালকে বলা হতো 'স্নাতক'। স্নাতক তিন রকমের: বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক এবং বিদ্যাব্রতস্নাতক।[১৬] কেবল একটি বেদ পাঠ সম্পন্ন করে সমাবর্তন হলে তাকে বলা হতো 'বিদ্যাস্নাতক'। গুরুগৃহে বারো বছর কেবল ব্রত পালন করে সমাবর্তন হলে 'ব্রতস্নাতক'। আর বিদ্যা এবং ব্রত উভয়ই সম্পন্ন করলে তাকে বলা হতো 'বিদ্যাব্রত স্নাতক'।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নির্দিষ্ট কাল ছাড়াও সমগ্র জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করা যেতো। যে ব্রহ্মচর্য মৃত্যু পর্যন্ত পালিত হতো তাকে বলা হতো 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য'। বলা হয়েছে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন, তাঁর সমস্ত পাপ দূরীভূত হয় এবং মৃত্যুর পরে তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পিতৃঋণও থাকে না, ফলে গার্হস্থ্য ধর্মের সংস্কার তাঁর জন্য আবশ্যক ছিল না। *মহাভারতে* ভীষ্ম, সুলভা, শিবা প্রমুখ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন।

জীবনের দ্বিতীয় পর্বে অবলম্বন করতে হতো গার্হস্থ্য আশ্রম। আর *বেদ* ও *স্মৃতি* অনুসারে চারটি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমকেই মনে করা হতো শ্রেষ্ঠ।[১৭] ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পর ব্রহ্মচর্যাশ্রমী শাস্ত্রানুসারে পত্নী গ্রহণ করে গার্হস্থ্য আশ্রম পালন করতেন। গার্হস্থ্য আশ্রমধর্ম পালনকারীকে বলা হতো 'গৃহস্থ' বা 'গৃহী'। গৃহস্থের বৃত্তি সম্পর্কে *মহাভারতে* বলা হয়েছে:

> গৃহস্থবৃত্তয়শ্চৈব চতশ্রঃ কবিভিঃ স্মৃতাঃ।
> কুশূলধান্যঃ প্রথমঃ কুম্ভধান্যস্তুরম্॥
> অশ্বস্তনোহথ কাপোতীমাশ্রিতো বৃত্তিমাহরেৎ।
> এষাং পরঃ পরো জ্যায়ান্ ধর্ম্মতো ধর্ম্মজিত্তমঃ॥[১৮]

অর্থাৎ গার্হস্থ্য জীবনের বৃত্তি ছিল চার রকম: কুশূলধান্য, কুম্ভধান্য, অশ্বস্তন ও কাপোতী। কুশূলধান্য বৃত্তি অবলম্বনকারীরা গোলা ভরে ধান সঞ্চয় করতেন। কুম্ভধান্য বৃত্তি অবলম্বন করতেন যাঁরা, তাঁরা ধান সঞ্চয় করতেন 'মেঠে'[১৯] ভরে। অশ্বস্তন বৃত্তি অবলম্বনকারীরা ভোজনের জন্য যেদিন যেটুকু প্রয়োজন কেবল সেটুকুই সঞ্চয় করতেন। আর কাপোতী বৃত্তি অবলম্বন করতেন যাঁরা, ক্ষেত থেকে কৃষক ধান নিয়ে যাওয়ার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, কপোতের ন্যায় সেটুকু কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কাপোতী বৃত্তিকে উঞ্ছবৃত্তিও বলা হতো। উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ সমাধিনিষ্ঠ, অনাসক্ত, সর্বভূতের হিতে রত হলে এবং জীর্ণপত্র, জল, ফলমূল ও বায়ু ভক্ষণ করে প্রাণ ধারণ করে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করলে সূর্যের ন্যায় তেজোময় রূপে পরমার্থ এবং স্বর্গ লাভ করতেন। *মহাভারতে* ধর্মারণ্য নামক এক ব্রাহ্মণ মহানাগ পদ্মনাভের কাছে অন্য এক উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কাহিনি শুনে ভৃগুবংশজাত চ্যবনের কাছে দীক্ষা নিয়ে উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। এই চার বৃত্তিধারী গৃহস্থরা ন্যায়ানুসারে অধিক ধর্ম করার কারণে ধারাবাহিকভাবে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতেন। এছাড়াও গার্হস্থ্য আশ্রম পালনের মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাও সুসংহত থাকতো। এ-প্রসঙ্গে মনিলাল বোস (M. L. Bose) বলেছেন: "The Grhastha was the economic support of the entire social structure composed of the four asramas."[২০]

গার্হস্থ্য জীবনের সকল কর্তব্যকেই বলা হতো ব্রত। ব্রত পালনে গৃহী দিনে ও রাতে একবার আহার গ্রহণ করতেন। এছাড়াও গার্হস্থ্য জীবনযাপনেও ছিল নানা-রকম বিধি-নিষেধ। গৃহী শুধু নিজের নিমিত্তে অন্নপাক বা দেবপূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধ ছাড়া পশুহত্যা করতেন না। প্রাণী বা অপ্রাণী হত্যা করতে হলে মন্ত্রের মাধ্যমে আগে সংস্কার করে নিতে হতো। অবশ্যই পিতা-মাতা, পত্নী, পুত্র, অতিথি ও ভৃত্যবর্গের ভোজনের পর ভোজন করতেন। বিশেষ করে অতিথি সেবা করা ছিল অবশ্য কর্তব্য। গৃহী কুলোচিত ধর্ম ও কর্ম অনুসারে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কেবল নিজের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতেন না, উপার্জিত ধন দ্বারা তিনি অতিথি, দেবতা ও পোষ্যবর্গের সেবা করতেন। কারো ধনের প্রতি তিনি লোভ করতেন না। ঋতুকাল ছাড়া স্ত্রীকে রমণে আহ্বান জানাতেন না। এছাড়া বিবাদের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে *মহাভারতে* মহর্ষি ব্যাস শুকদেবকে বলেছেন:

স্বদারনিরতো দান্তো হ্যনসূয়ুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ঋত্বিক্‌পুরোহিতার্য্যৈর্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ॥
বৃদ্ধাবালাতুরৈর্ব্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ।
মাতাপিতৃভ্যাং জামীভিভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া॥
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ।
এতান্ বিমুচ্য সংবাদান্ সর্বপাপৈর্বিমুচ্যতে॥[২১]

উপর্যুক্ত বিধান অনুসারে গৃহী নিজ ভার্যায় নিরত থাকতেন। জিতেন্দ্রিয় রূপে কারো দোষ অন্বেষণ করতেন না। ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, পীড়িত, চিকিৎসক, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বান্ধব, যাতা, পিতা, ভগিনী, ভ্রাতা, পুত্র, ভার্য্যা, দুহিতা ও ভৃত্যবর্গের সঙ্গে বিবাদে জড়াতেন না এবং এর মাধ্যমে সকল পাপ থেকে বিমুক্ত হতেন।

গৃহী প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞ করতেন। যজ্ঞগুলি হলো: ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ। 'ব্রহ্মযজ্ঞ' হলো অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। যার মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য জীবনের ঋষি ঋণ শোধ হয় বলে মনে করা হতো। ঋষিরা সত্যদ্রষ্টা ও জ্ঞানের প্রচারক রূপে স্বীকৃত ছিলেন। সে-কারণে গার্হস্থ্য জীবনে তাঁদের জ্ঞানকে আত্মস্থ করে অন্যকে দান করতে হতো। 'পিতৃযজ্ঞের' মধ্যমে মনে করা হতো পিতৃপুরুষের ঋণ শোধ হয়। মূলত 'তর্পণের'[২২] নামই পিতৃযজ্ঞ। পরলোকগত পূর্ব-পুরুষের আত্মার শান্তির জন্য যেকোনো

একটি শাস্ত্রীয় বিধি প্রতিদিন পালন করা ছিল কর্তব্য। শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি সংস্কার পূর্ব-পুরুষের আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যই করা হতো। পিতৃপুরুষের পরিতৃপ্তির মতো দেবতাদের পরিতৃপ্তির জন্য করা হতো 'দৈবযজ্ঞ'। সাধারণত হোম করাকেই বলা হতো দৈবযজ্ঞ। অর্থাৎ যে শক্তিসমূহ দেবতারূপে জগতের কল্যাণ করেন, হোমের মাধ্যমে তাঁদেরকে তুষ্ট করা। আর সর্বভূতের উদ্দেশ্যে ভোজনের অগ্রভাগ নিবেদন করাকে বলা হতো 'ভূতযজ্ঞ'। এই যজ্ঞের মাধ্যমে সর্বভূতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হতো। আর অতিথিসেবাই হলো 'নৃযজ্ঞ' বা 'মনুষ্যযজ্ঞ'। যার মাধ্যমে মনুষ্য ঋণ শোধ হতো, আর মানুষেরা গৃহস্থাশ্রম প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বর্গলোকে যাত্রা করতেন।

জীবনের চতুর্ভাগের তৃতীয় ভাগে পৌঁছে পালন করতে হতো বানপ্রস্থাশ্রম। এই আশ্রম গ্রহণের সময় সম্পর্কে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে: "গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলী পলিতমাত্মনঃ।/অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥"[২৩] অর্থাৎ গৃহস্থ যখন আপন চর্মশিথিলতা, পক্বকেশ ও পুত্রের সন্তান দেখতেন, তখন আশ্রয় নিতেন বনে। যাত্রাকালে পত্নীকে পুত্রের কাছে রেখে বা পত্নীর সম্মতি থাকলে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সেখানে বাসকালে তাঁরা পূজা এবং 'দক্ষিণাগ্নি', 'গার্হ্যপত্য' ও 'আহবনীয়' অগ্নিত্রয়ের সেবা করতেন। কোনো ব্যক্তি অধ্যাপনাসহ পঞ্চযজ্ঞের জন্য এলে বানপ্রস্থাশ্রমী নিজের উৎপন্ন ধান, যব, ভুক্তাবশিষ্ট ও হবি দান করতেন। বানপ্রস্থাশ্রম পালনকালে চার রকম বৃত্তি অবলম্বন করা যেতো। এ-প্রসঙ্গে *মহাভারতের* শান্তিপর্বে ব্যাসদেব বলেছেন:

> বানপ্রস্থাশ্রমেহপ্যেতাশ্চতস্রো বৃত্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
> সদ্য প্রক্ষালকাঃ কেচিৎ কেচিন্মাসিকসঞ্চয়াঃ॥
> বার্ষিকং সঞ্চয়ং কেচিৎ কেচিদ্দাদশবার্ষিকম্।
> কুর্বন্ত্যতিথি পূজার্থং যজ্ঞতন্ত্রার্থমেব বা॥[২৪]

বানপ্রস্থাশ্রমের চারটি বৃত্তি হলো: প্রাত্যহিক সঞ্চয়, মাসিক সঞ্চয়, বার্ষিক সঞ্চয় ও দ্বাদশ বার্ষিক সঞ্চয়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, বানপ্রস্থাশ্রমে সচ্চরিত্র, পাপাচারমুক্ত ও সুশীল হতেন। ইহলোক ও পরলোকের নিমিত্তে তিনি কোনো কাজ করতেন না, ক্রোধ, মোহ ও সন্ধিবিগ্রহ ত্যাগ করে উদাসীনের মতো থাকতেন।[২৫] বানপ্রস্থাশ্রমী যদি আয়ুর শেষ চতুর্ভাগে রোগগ্রস্ত হতেন তাহলে বানপ্রস্থাশ্রম ত্যাগ করতেন। এরপর 'সর্ব্ববেদোক্ত' ও দক্ষিণাযুক্ত 'সাদ্যস্ক' যজ্ঞ করে তিনি ব্রহ্মধ্যায়ী ব্রহ্মানুযুক্ত, ব্রহ্মমোদী ও ব্রহ্মাশ্রিত হতেন। পরমাত্মা দর্শনের জন্যও গৃহী বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করতেন। *মহাভারতে* ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কুন্তি, গান্ধারী এবং সঞ্জয় বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেছিলেন। এছাড়াও বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেছিলেন যযাতি। শাস্ত্রবিধি অনুসারে তিনি আশ্রমধর্ম পালন করে স্বর্গে গমন করেছিলেন। কুরু বংশের রাজা পাণ্ডুও বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনকে অবৈধ বলা হয়েছে; কেননা কিন্দম মুনিকে হত্যা করে অসময়ে তিনি বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেছিলেন। অর্থাৎ শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে তিনি এই আশ্রমধর্ম পালন করেননি।

'সন্ন্যাস' হলো জীবনের সর্বশেষ আশ্রম। *ঋগ্বেদে* কোথাও এর উল্লেখ নেই,[২৬] তবে *যজুর্বেদীয়* বিধান অনুসারে পঞ্চমন্ত্র উচ্চারণ করে পঞ্চবায়ুর উদ্দেশ্যে পাঁচটি বা ছয়টি গ্রাস ভক্ষণ করে, কেশ লোম নখ কেটে গঙ্গাস্নানের পর বানপ্রস্থাশ্রমী সন্ন্যাস আশ্রমে গমন করতেন। সন্ন্যাসীরা সাধারণত চার রকম হয়ে থাকেন। এ-প্রসঙ্গে মহাদেব পার্বতীকে বলেছেন:

> চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচরবহুদকৌ।
> হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥
> অতঃ পরতরং নাস্তি নাবরং ন তিরোগ্রতঃ।
> অদুঃখমসুখং সাম্যমজরামরমব্যয়ম্॥[২৭]

অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে কুটীচর, বহুদক, হংস ও পরমহংস; এই চার রকম সন্ন্যাসীর পরিচয়ই জানা যায়। এদের মধ্যে কুটীচর অপেক্ষা বহুদক, বহুদক অপেক্ষা হংস এবং হংস অপেক্ষা পরমহংস সন্ন্যাসীগণ শ্রেষ্ঠ। পরমহংসের সম্মুখ থেকে পরমাত্মা অন্তর্হিত হতেন না। সুখ, দুঃখ, জরা, মরণ, ক্ষয় কিছুই তাঁদের ছিল না; সর্বত্র তাঁরা সমদর্শী হতেন আর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণকে জয় করে বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে অবস্থান করতেন। কুটীচর সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরচিন্তা করতেন একস্থানে বসে। নিজ স্ত্রী-সন্তানদের কাছ থেকেও তারা ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। কিন্তু বহুদক সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা গ্রহণ করতেন কেবল সত্যনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রাহ্মণের কাছেই। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে তাঁরা ঈশ্বরের সাধনা করতেন। কিন্তু হংস সন্ন্যাসীরা কোথাও এক রাতের বেশি থাকতেন না। এর মধ্যে বহুদক সন্ন্যাসীরা কেবল তীর্থভ্রমণই করতেন না, সমাজের কল্যাণের জন্যও কাজ করতেন। যেমন, ঋষি মৈত্রেয় কৌরবদের কল্যাণের জন্য কাম্যক বনে পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে দেখা করে হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকে উপদেশ দিয়ে তিনি বলেছেন: "মহাবাহু, আমি তোমার হিতের জন্য বলছি শোন, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ করো না।"[২৮] মৈত্রেয়র মতো মার্কেণ্ডেয়, বৃহদশ্ব, লোমশ প্রমুখ ঋষিগণও সমাজের হিতের জন্য কাজ করেছেন। এইসব সন্ন্যাসী সম্পর্কে *মহাভারতে* বলা হয়েছে: "নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।/ কালমেব প্রতীক্ষত নিদেশং ভৃতকো যথা॥"[২৯]

অর্থাৎ একজন সন্ন্যাসী কখনও জীবন বা মৃত্যুর প্রশংসা করতেন না; বরং প্রভুর আদেশের জন্য ভৃত্য যেভাবে প্রতীক্ষা করেন সে-রকমভাবে তাঁরা কালের জন্য প্রতীক্ষা করতেন। মূলত ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনের মাধ্যমে মানুষ মনের পঙ্কিলতা শিথিল করার পর সর্বোৎকৃষ্ট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করতেন।[৩০] *মহাভারতীয়* সমাজে সে-কারণেই চতুরাশ্রমের মাধ্যমে বৃত্তি সুনির্দিষ্ট করে মানুষের সামাজিক জীবনকে সুশৃঙ্খলিত ও সুবিন্যস্ত করা হয়েছিল। সুবিন্যস্ত সে-জীবনধারায় জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'মোক্ষ' প্রাপ্তির বাসনা। এ-প্রসঙ্গে মনিলাল বোস (M. L. Bose) বলেছেন: "The ultimate end of man was the attainment of moksha or salvation, a culmination of the first-three stages of life. For that the more serious person was advised to go for vanaprastha and sannyasa successively."[৩১] ফলে মোক্ষ লাভের জন্যও বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

মহাভারতে আশ্রমকে ধর্ম বলা হলেও চার বর্ণের জন্য সাধারণ ও স্বতন্ত্র ধর্মের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। চতুর্বর্ণের সনাতন ধর্ম সম্পর্কে যুধিষ্ঠিরকে অবহিত করেছিলেন মহামহিম ভীষ্ম। তাঁর মতে, সনাতন ধর্মানুসারে চার বর্ণেরই সাধারণ ধর্ম নয়টি: অক্রোধ, সত্য বলা, সমবিভাগ, ক্ষমা, নিজ স্ত্রীর সঙ্গে রমণ, পবিত্রতা, দ্রোহ বা শত্রুতা না করা, সরলতা ও ভৃত্যদের ভরণপোষণ করা। মহামহিম ভীষ্মের বর্ণনানুসারে ব্রাহ্মণের চিরন্তন ধর্ম হলো ইন্দ্রিয় দমন করা; আর সনাতন ধর্ম হলো বেদাভ্যাস।[৩২] এছাড়া ব্রাহ্মণেরা যাজনও করতেন। আর ক্ষত্রিয়রা নিজে *বেদ* অধ্যয়ন করতেন কিন্তু অন্যকে *বেদ* অধ্যয়ন করাতে পারতেন না। প্রজা পালনের সঙ্গে তাঁরা সবসময় যুদ্ধক্ষেত্রে দস্যুবধ করতেন।[৩৩] যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, দান ও শুচিতার সঙ্গে ধনসঞ্চয় করা ছিল বৈশ্যের ধর্ম।[৩৪] প্রজাপতির বর্ণনায় শূদ্রকে দাস রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সে-কারণে অপর তিন বর্ণের পরিচর্যা করা শূদ্রের ধর্ম।[৩৫] বর্ণাশ্রমধর্ম সম্পর্কে Cybelle Shattuk বলেছেন: "The delineation of what constitutes correct actions was carefully elaborated in a system called varnashrama-dharma, duties in accord with caste (varna) and stage of life (ashrama)."[৩৬]

শাস্ত্রনিহিত জটিল এইসব বিধি-নিষেধকে এড়িয়ে পাণ্ডবদের প্রথম রাজা যুধিষ্ঠির মানবিক সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঈপ্সিত সেই সমাজ সম্পর্কে 'বনপর্বে' তিনি বলেছেন: "মনোমালিন্য-পরিত্যাগই স্নান, প্রাণিগণকে রক্ষা করাই দান, লোভে অনন্ত ব্যাধি, সকলের সুখ ইচ্ছা করাই দয়া।"[৩৭]

আর *মনুসংহিতা* অনুসারে ধর্মের লক্ষণ দশটি: ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী, বিদ্যা, সত্য ও ক্রোধভাব।[৩৮] চতুরাশ্রম পালনকারী 'দ্বিজগণ' সে-কালে ধর্মের এই দশ লক্ষণ যত্নসহ পালন করতেন। দশ লক্ষণযুক্ত এই ধর্ম সংযতভাবে পালন করে, বেদান্ত শ্রবণের মাধ্যমে পিতৃঋণ, দেবঋণ ও ঋষিঋণ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা গ্রহণ করতেন সন্ন্যাস আশ্রম।

৪.

আদিম যাযাবর অবস্থা থেকে উত্তরীত সমাজ-কাঠামো প্রণয়নের অনিবার্যতা থেকেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় সৃজিত হয়েছিল কৃষিভিত্তিক ও নগর-সভ্যতাকেন্দ্রিক সামাজিক জীবন ধারা। *মহাভারতে* বর্ণিত সুদীর্ঘকাল-ব্যাপ্ত সেই সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ছিল বর্ণাশ্রম দ্বারা। বর্ণের ভিত্তিতে সে-সময় জীবীকা এবং আশ্রম অনুসারে জীবনাচার নির্দিষ্ট ছিল। তার মাধ্যমেই সামাজিক ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা হয়েছিল শ্রেণিগত শৃঙ্খলা। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তাঁদের বর্ণ অনুসারে নির্ধারিত জীবিকা নির্বাহ ও আশ্রম প্রতিপালন করতেন। আশ্রমকে সে-কালে ধর্মও বলা হতো। মানুষের জীবনাচারকে সুসংহত করা হয়েছিল আশ্রমধর্মের বিধানের মাধ্যমে। ফলে একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে পুরো সামাজিক ব্যবস্থা আবর্তিত হতো। পরবর্তীকালে সে-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং কর্মানুসারেও তখন বর্ণপ্রাপ্ত করা যেতো। উদার এই ব্যবস্থার ফলেই পরিবর্তিত সমাজে এক বর্ণের জন্য নির্ধারিত কর্ম অন্য বর্ণের লোকেরাও পালন করতে পারতেন। পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সামাজিক শৃঙ্খলা তার ফলে কিছুটা বিঘ্নিত হলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর মূলত তার মাধ্যমেই নির্মিত হয়েছে নতুন মানব সমাজ। যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, *মহাভারত*ীয় সমাজের বর্ণাশ্রমকেন্দ্রিক কর্মবিন্যাসের পরিবর্তন কেবল সামাজিক ব্যবস্থারই পরিবর্তন নয়, যুগের দাবি অনুসারে সেটি নতুন কালের সৃজনও।

টীকা ও গ্রন্থপঞ্জি

১ রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস*, অঞ্জন গোস্বামী অনুদিত, হায়দ্রাবাদ: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২০, ৪৭

২ *মহাভারতে* রাজা পৃথু প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "বেণপুত্র পৃথু বিষ্ণু থেকে অষ্টম পুরুষ। পুর্বোৎপন্ন সূত ও মাগধ নামক দুই ব্যক্তি পৃথুর স্তুতিপাঠক হলেন। পৃথু সূতকে অনূপ-দেশ (কোনও জলময় দেশ) এবং মাগধকে মগধ দেশ দান করলেন। ভূপৃষ্ঠ অসমতল ছিল, পৃথু তা সমতল করলেন। বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ঋষিগণ পৃথুকে পৃথিবীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পৃথুর রাজত্বকালে জরা ব্যধি তস্কর প্রভৃতির ভয় ছিল না, তিনি পৃথিবী দোহন করে সপ্তদশ প্রকার শস্য ও বিবিধ অভিষ্ট বস্তু উৎপাদন করেছিলেন।" [শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারত*, রাজশেখর বসু অনুদিত, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ২০২৩, ৪৯৩]।

৩ শঙ্কর শীল, *মহাভারতের নরনারী*, কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১১, ১৪৬

৪ নীলাঞ্জনা সিকদারদত্ত অনু. ও সম্পা., *বেদগ্রন্থমালা: ঋগ্বেদ-সংহিতা*, কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০২৩, ২৫৪

৫ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব্ব, খণ্ড-৩৭, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ অনূ., কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৯৩, ৩২৭৬

৬ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ভীষ্মপর্ব্ব, খণ্ড-১৭, ১৯৮০, ৩১৮

৭ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব্ব, খণ্ড-৩২, ১৯৯৩, ৫৯০

৮ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারতীয় সমাজ*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০১, ৭৪

৯ Patrick Olivelle, *The Asrama System: The History and Hermeneutics of a Religious Institution*, New York: Oxford University Press, 1993, 153

১০ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব্ব, খণ্ড-৩২, ৫৮৩

[১১] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব্ব, খণ্ড-৩২, ৫৮৯
[১২] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব্ব, খণ্ড-৩২, ৬১২
[১৩] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব্ব, খণ্ড-৩২, ৬২০
[১৪] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারত*, ২০২৩, ৪৯৪
[১৫] মহর্ষি মনু, *মনুসংহিতা*, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত, কলকাতা: আনন্দ, ২০২৩, ৮৫
[১৬] শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, *মহাভারতের সমাজ*, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৫৯, ১০৪
[১৭] "সর্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।/ গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্তি হি॥" [মহর্ষি মনু, ১৭৪]
[১৮] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব্ব, খণ্ড-৩৫, ১৯৯৩, ২৪৫৩
[১৯] 'মেঠে' শব্দটি হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর *মহাভারতম্* গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। আর ভারতকৌমুদী টীকায় এটিকে বলা হয়েছে 'বৃহন্মৃৎপাত্র'।
[২০] M. L. Bose, *Social and Cultural History of Ancient India*, New Delhi: Concept Publishing Company, 1998, 70
[২১] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব্ব, খণ্ড-৩৫, ২৪৫৬
[২২] সংস্কৃত 'তৃপ্' শব্দ থেকে তর্পণ শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ সন্তুষ্ট করা। সাধারণত পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ করে তিল, জল দান করাকে তর্পণ বলা হয়।
[২৩] মহর্ষি মনু, ১৬৫
[২৪] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব্ব, খণ্ড-৩৫, ২৪৬২
[২৫] "সুশীলবৃত্তো ব্যপনীতকল্মষো ন চেহ নামুত্র চ কর্ত্তু মীহতে।/অরোষমোহো গতসন্ধিবিগ্রহো ভবেদুদাসীনবদাত্মাবিন্নরঃ॥" [শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব্ব, খণ্ড-৩৫, ২৪৬৮]
[২৬] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *ভারতের প্রাচীন ধর্মীয় সম্প্রদায়*, সোমব্রত সরকার সম্পা., কলকাতা: খড়ি প্রকাশনী, ২০২৪, ২৪
[২৭] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, অনুশাসনপর্ব্ব, খণ্ড-৪০, ১৯৯৩, ১৫৩৪
[২৮] মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারত*, ২০২৩, ১৪৪
[২৯] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব্ব, খণ্ড-৩৫, ২৪৭৩
[৩০] "কষায়ং পাচয়িত্বাশু শ্রেনিস্থানেষু চ ত্রিষু।/ প্রব্রজেচ্চ পরং স্থানং পরিব্রজ্যমনুত্তমম্॥" [শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব্ব, খণ্ড-৩৫, ২৪৭০]
[৩১] M. L. Bose, *Social and Cultural History of Ancient India*, New Delhi: Concept Publishing Company, 1998, 83
[৩২] "অক্রোধঃ সত্যবচনং সংবিভাগঃ ক্ষমা তথা।/ প্রজনঃ স্বেষু দারেষু শৌচমদ্রোহ এব চ॥/ আর্জ্জবং ভৃত্যভরণং নবৈতে সার্ব্ববর্ণিকাঃ।/ ব্রাহ্মণস্য তু যো ধর্ম্মস্তত্তে বক্ষ্যামি কেবলম্॥" [শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, অনুশাসনপর্ব্ব, খণ্ড-৩৯, ১৯৯৩, ৫৭০]
[৩৩] "নাধ্যাপয়েদধীয়ীত প্রজাশ্চ পরিপালয়েৎ।/ নিত্যোদ্যুক্তো দস্যুবধে রণে কুর্য্যাৎ পরাক্রমম্॥" [শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, অনুশাসনপর্ব্ব, খণ্ড-৩৯, ৫৭১]
[৩৪] "বৈশ্যস্যাপি যো হি ধর্ম্মস্তং তে বক্ষ্যামি শাশ্বতম্।/ দানমধ্যয়নং যজ্ঞঃ শৌচেন ধনসঞ্চয়ঃ॥" [শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, অনুশাসনপর্ব্ব, খণ্ড-৩৯, ৫৭৩]
[৩৫] "প্রজাপতির্হি বর্ণানাং দাসং শূদ্রমকল্পয়ৎ।/তস্মাচ্ছূ দ্রস্য বর্ণানাংপরিচর্য্যা বিধীয়তে॥" [শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারতম্*, অনুশাসনপর্ব্ব, খণ্ড-৩৯, ৫৭৪]
[৩৬] Cybelle Shattuck, *Hinduism*, London: Routledge, 1999, 31
[৩৭] শঙ্কর শীল, ১৫০
[৩৮] "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।/ ধীর্বিদ্যা সত্যোমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥ [মহর্ষি মনু, ১৭৪]